জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২০

পরা-নীতিবিদ্যক মতবাদ হিসেবে নৈতিক প্রকৃতিবাদের মূল্যায়ন

মো. কোরবান আলী*

Abstract

Can moral judgment be true or false? Are they informative or cognitive? What is the relationship between fact and value? Based on these meta-ethical questions, contemporary ethics has been divided into two categories; cognitivism and non-cognitivism. According to cognitivism, moral judgment has informative or cognitive value. They are informational or knowledgeable. Mathematical, scientific and historical statements have a similar relation to natural facts and information, and moral judgments have a similar relationship with natural facts and information, such as: 'lying is a sin', 'do not steal', these judgments are objectively right. The cognitivists are again divided into two groups. (A) Moral naturalism: Moral judgment can be analyzed with the help of non-moral or natural terms or judgments. (B) Moral non-naturalism: Moral judgment is never in accordance with non-moral judgment. Moral judgments are simple and non-natural and cannot be analyzed with natural terms. The purpose of the present article is to evaluate moral naturalism as a meta-ethical theory.

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর দর্শন শুরুই হয়েছিল প্রকৃতিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। আধুনিক দার্শনিকদের অনেকেই মনে করেছিলেন যে তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু বিজ্ঞানের সাথে অবিচ্ছিন্ন। কাজেই মানব প্রকৃতি এবং এ জাতীয় অন্যান্য তথ্যসমূহকে তাঁরা নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা এবং জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করতেন। এর বিরুদ্ধে Frege যুক্তি দিয়ে বলেন যে, যুক্তিবিদ্যায় মনস্তাত্ত্বিকতাবাদ (psychololism)[১] এর প্রবর্তন একটা ভুল ছিল। তিনি বলেন, যুক্তিবিদ্যা তার নিজস্ব সত্যতা এবং মিথ্যাত্বের মানদণ্ড নিয়ে একটি স্ব-শাসিত বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মন কিভাবে কাজ করে অথবা যেকোন প্রাকৃতিক ঘটনা কিভাবে ঘটে, এ ব্যাপারে যুক্তিবিদ্যার ঐ সকল মানদণ্ডের কিছুই করার নেই। সেই সময়ই রচিত হলো বিংশ শতাব্দীর নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ G. E. Moore এর *Principia Ethica (1903)*। এই গ্রন্থে ম্যুর বলেন, প্রকৃতিবাদ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভ্রান্তি। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, ভালোত্বকে যেকোন প্রাকৃতিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বর্ণনা করার অর্থ হচ্ছে যেকোন নীতিবিদ্যার সম্ভাব্যতাকে পুরোপুরি অসঙ্গত করে তোলা।[২] ফ্রেগে, ম্যুর এবং অন্যান্য সমমনা দার্শনিকেরা মিলে একটি যুগের সূচনা করেন, যেখানে যুক্তিবিদ্যা এবং ভাষা ছিল কর্তৃত্বপূর্ণ দার্শনিক আলোচনার বিষয় এবং সাথে সাথে অস্পষ্ট ধারণাগত তথ্যমূলক বিষয়গুলোকে বড় মাপের দার্শনিক পাপ হিসেবে অভিহিত করা হতো। এই যুগে দর্শনকে বিজ্ঞান থেকে আলাদা বলে ভাবা হতো। এটাকে মনে হতে পারে একটা অদ্ভুত কল্পনা, বিশেষ করে যেখানে নীতিবিদ্যা জড়িত। কেননা কেউ মনে করতে পারেন নীতিদার্শনিকেরা কাজ করেন মূলত মনোবিজ্ঞান (যা মানুষের চিন্তা ও প্রেষণার স্বরূপ বর্ণনা করে), সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান (যা মানব ও সমাজ জীবনের গঠনকে বর্ণনা করে), ইতিহাস (যা নৈতিক বিশ্বাস এবং নৈতিক চর্চার অগ্রগতি অনুসন্ধান করে), এবং বিবর্তনমূলক জীববিদ্যা (যা মানুষের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা করে) কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে। কিন্তু উক্ত সকল বিষয়ই নৈতিকতার দার্শনিক চিন্তার সাথে অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতো। এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, প্রকৃতিবাদ কখনই পুরোপুরিভাবে মুছে যাবে না। জন ডিউই ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

প্রভাবশালী প্রকৃতিবাদী দার্শনিক এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁর মাধ্যমে প্রকৃতিবাদ আবার ফিরে আসে, এমনকি বিশ্লেষণী দার্শনিকদের মধ্যেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন মন সম্পর্কিত, জ্ঞান সম্পর্কিত এমন কি যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত প্রকৃতিবাদী তত্ত্বগুলো আবার একবার রক্ষিত হয়। নীতিবিদ্যায় প্রকৃতিবাদ হয়ত আজীবন সন্দেহের চোখে থাকবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতিবাদ হচ্ছে নীতিবিদ্যার স্বরূপ বিষয়ক এক বিশাল জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সমাহার।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দার্শনিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এ প্রবন্ধটি একটি স্বতন্ত্র প্রয়াস হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, একজন বাঙালি হিসেবে নৈতিক প্রকৃতিবাদের মতো এরকম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরা-নীতিবিদ্যক মতবাদকে বাংলা ভাষায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী তথা দর্শনানুরাগী পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করার তাগিদ থেকে উক্ত প্রবন্ধটি রচনার কাজে নিয়োজিত হই। তাছাড়া নীতিদর্শন ও নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষের একধরনের ভীতি পরিলক্ষিত হয়। এই ভীতি দূর করার জন্য এ ধরনের গবেষণার যৌক্তিকতা আছে এবং দর্শন অনুরাগী হিসেবে আমার একাডেমিক উৎকর্ষ এবং গবেষণার পরিপূর্ণতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ প্রবন্ধটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। অত্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, একটি পরা-নীতিবিদ্যক মতবাদ হিসেবে নৈতিক প্রকৃতিবাদী মতবাদকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এবং উক্ত মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখা যায় তার বিচারমূলক বিশ্লেষণ করা। এ ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিকে সমর্থন বা সমালোচনা করা মূল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

গবেষণা পদ্ধতি

আমার গবেষণার পদ্ধতি হবে গুণগত। সুতরাং বর্ণনামূলক বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, বই, জার্নাল, এবং তত্ত্বাবধায়কের বক্তৃতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধারণা ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হবে। তাছাড়া গবেষণা-কর্মটিতে ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নৈতিক প্রকৃতিবাদী মতবাদকে ব্যাখ্যা করা হবে। আলোচ্য গবেষণার বিশ্লেষণের একক নিঃসৃত হবে মূলত নৈতিক অবধারণ সংক্রান্ত আদর্শনিষ্ঠক ভাবনা ও পরানীতিবিদ্যক বিভিন্ন প্রকৃতিবাদী ও অন্যান্য তত্ত্ব থেকে। যেহেতু মুখ্য ও গৌণ উপাত্তের উপর ভিত্তি করে গবেষণা-কর্মটি পরিচালিত হবে, সেহেতু নৈতিক অবধারণ সংক্রান্ত প্রচলিত প্রকৃতিবাদী মতবাদগুলো প্রাথমিক উপাত্ত এবং সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয়গুলো গৌণ উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

নৈতিক প্রকৃতিবাদের অর্থ ও সংজ্ঞা

নৈতিক প্রকৃতিবাদ হল নীতিবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বোধগম্য করার প্রচেষ্টা। প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের যাচাইকৃত নৈতিক বিশ্বাস বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈরি হয়। প্রকৃতিবাদ অনুসারে নৈতিক পদ (ভাল, মন্দ, ন্যায্য, অন্যায্য) বা অবধারণকে কতকগুলি প্রাকৃতিক গুণাবলি বা ন-নৈতিক (non-ethical) গুণাবলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই মতবাদ অনুসারে, যখন কেউ কোন নৈতিক উক্তি উচ্চারণ করে তখন সেই উক্তির অর্থের কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই তাকে ন-নৈতিক উক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।

নৈতিক প্রকৃতিবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রশ্নে John Hospers প্রকৃতিবাদের পাঁচ ধরনের সংজ্ঞার কথা বলেন,[৩] সেগুলো হলো:

(ক) আত্মজৈবনিক সংজ্ঞা (The Autobiographical Definition): এই মতবাদ অনুসারে, যখন আমি বলি যে একটি নির্দিষ্ট কাজ ভাল, তার অর্থ এই যে, আমি কাজটিকে সমর্থন করি অর্থাৎ কাজটি

সঠিক। যখন আমি বলি কাজটি সঠিক, তখন আমি বাস্তবিকপক্ষে কাজটির স্বরূপ অথবা গুণ সম্পর্কে কিছু বলি না। আমি শুধু বলি যে, কাজটির প্রতি আমার এক ধরনের সন্দেহাতীত মনোভাব আছে, যেটি হচ্ছে অনুমোদনের মনোভাব (অথবা নৈতিক অনুমোদনের মনোভাব)।

(খ) সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা (The Sociological Definition): এই মতবাদ অনুসারে, "ক' হয় ভাল' এর অর্থ হচ্ছে 'বেশিরভাগ মানুষ 'ক'-কে অনুমোদন করে'। এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে: এটা হতে পারে আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষ অথবা দেশের বেশিরভাগ মানুষ, অথবা বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ, অথবা হতে পারে বিশ্বের ইতিহাসের সকল যুগের মানুষ একত্রে। তাহলে কীভাবে একজন ব্যক্তি জানতে পারবে যে 'ক' নামক কাজটি ভাল বা সঠিক? এই মতবাদ অনুসারে, 'ক' ভাল কি না সে ব্যাপারে ভোট গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) ধর্মতাত্ত্বিক সংজ্ঞা (The Theological Definition): প্রকৃতিবাদের এই সংজ্ঞা অনুসারে, যদি বলা হয় 'ক' হয় ভাল তার অর্থ ঈশ্বর এটিকে অনুমোদন করে (অথবা ঈশ্বর এটি করতে আদেশ করে)। তাঁদের মতে, ' 'ক' হয় ভাল' এটা উপরোক্ত আত্মজৈবনিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রকৃতিবাদীদের মতো কোন অভিজ্ঞতামূলক উক্তি নয়, কিন্তু তা একধরনের ধর্মতাত্ত্বিক উক্তি। তাঁদের মতে সব নৈতিক উক্তিই ছদ্মবেশী ধর্মতাত্ত্বিক উক্তি। সেই হিসেবে যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছুকে ভাল বলে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তার উক্তি শুধুমাত্র মিথ্যাই নয় বরং স্ব-বিরোধী। কেননা তিনি বলছেন যে কাজটি হয় ভালো (অর্থাৎ ঈশ্বর কাজটি অনুমোদন করেন) কিন্তু ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নয়– যদিও নাস্তিকদের ন্যায্যতা এবং অন্যায্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, তারপরও তাদের সকল দৃষ্টিভঙ্গি ভুল।

(ঘ) আদর্শ-পর্যবেক্ষক সংজ্ঞা (The Ideal-observer Definition): এই মতানুসারে, যখন বলা হয় "ক' হয় ভাল ' তখন তারা বলতে চান যে, আমি অথবা তুমি অথবা বেশিরভাগ মানুষ 'ক' কে অনুমোদন করে বলেই তা ভাল বিষয়টা তা নয়, বরং একজন আদর্শ পর্যবেক্ষক 'ক' কে অনুমোদন করেন তাই তা ভাল। আদর্শ পর্যবেক্ষক (অথবা আদর্শ বিচারক) বলতে তারা বলেন[৪], তিনিই হচ্ছেন আদর্শ পর্যবেক্ষক :

(১) যিনি নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন, সমদর্শী।
(২) বিচার করার সময় বা পর্যবেক্ষণ করার সময় প্রত্যেকটা পরিস্থিতির প্রত্যেকটা ঘটনা সম্পর্কে যার পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকে।
(৩) যিনি কল্পনাশক্তির সাহায্যে পরিস্থিতির সাথে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে নিজেকে একাত্ম করতে সক্ষম।
(৪) যিনি নিরাসক্ত, নিষ্কাম।
(৫) যিনি অবিচলিত।
(৬) যিনি নিয়মতান্ত্রিক।

যদি কোন ব্যক্তি উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির অধিকারী হন, তিনি হবেন যেকোন পরিস্থিতি বিচারের একজন আদর্শ বিচারক এবং তিনি অব্যর্থভাবে বলতে পারবেন কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ। শুধু তাই নয়, আদর্শ পর্যবেক্ষকের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি 'ভাল' ও 'মন্দ'-এর অর্থ বলে দিবে।

(ঙ) উপযোগবাদী সংজ্ঞা (The Utilitarian Definition): এই মতবাদ অনুসারে 'ক হয় ভাল' এর অর্থ হচ্ছে 'ক' নামক কাজটি সর্বোচ্চ সুখ উৎপাদন করবে (পরিণামে, সকল ক্ষেত্রে)। এই মতবাদ অনুসারে একটি কাজকে আমরা ভাল বলব যদি ঐ কাজটির নির্দিষ্ট কিছু পরিণতি থাকে, যে পরিণতি সকল ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমানে সুখ উৎপাদন করবে।

প্রকৃতিবাদের বিচারমূলক বিশ্লেষণ

নৈতিক প্রকৃতিবাদকে সংজ্ঞায়িত করার উপরোক্ত প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে দাবি করা হয় যে, নীতিবিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে নৈতিক গুণসমূহ (যেমন: ভালোত্ব এবং মন্দত্ব, ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য ইত্যাদি) প্রাকৃতিক গুণসমূহের সাথে অভিন্ন, কাজেই নৈতিক গুণসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দেয়া সম্ভব। নৈতিক প্রকৃতিবাদীরা আরও মনে করেন যে, যাচাইকৃত নৈতিক বিশ্বাসসমূহ একটি বিশেষ ধরনের কার্য-কারণিক প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়।

নৈতিক প্রকৃতিবাদের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় মতবাদটি শুরু হয় ভালোত্বকে আমাদের স্বার্থের পরিতৃপ্তির মাধ্যমে নির্ণয়ের চেষ্টার দ্বারা। এখানে স্বার্থকে বর্ণনা করা হয় পছন্দের বিষয়বস্তু হিসেবে। আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে রক্ষা করা আমাদের পছন্দ, কেননা আমরা কামনা করি যে আমরা যদি দেখতে না পাই তাহলে হতাশ হয়ে যাব। তাই অক্ষত দৃষ্টিশক্তিই ভাল। আবার শিশুদেরকে রক্ষা করা বা নিরাপদে রাখা একটি ভালো কাজ। তাই আমরা শিশুদের যত্ন নিই এবং আমরা কখনও আশা করি না যে তারা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোক। Hobbes এর মতে, "Whatever is the object of any man's appetite or desire, that is it which he for his part calleth good."[৫] প্রকৃতিবাদীদের মতে আমাদের কী করা উচিত এ সম্পর্কে জানতে হলে আগে দেখতে হবে কীভাবে আমাদের স্বার্থ পরিতৃপ্ত হয়।

অ-প্রকৃতিবাদী G.E. Moore বিশ্বাস করতেন যে দুটি কারণে প্রকৃতিবাদীদের উপরি-উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। **প্রথমত:** 'ভালো' বলতে আমরা কী বুঝি এবং 'আমাদের স্বার্থের পরিতৃপ্তি' বলতে কী বুঝি? তিনি বলেন, আমরা যদি আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট করি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, তারা কখনই এক জিনিস নয়। ম্যুর বলেন, উপরোক্ত দুটি বিষয় যে পরস্পর থেকে পৃথক তা বোধগম্য হওয়ার জন্য আমাদেরকে কেবলমাত্র উক্ত ধারণা দুটি সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া দরকার। **দ্বিতীয়ত:** ম্যুর নৈতিক প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যে যুক্তিটির অবতারণা করেন তা 'উন্মুক্ত প্রশ্ন যুক্তি' (open question argument) নামে পরিচিত। 'যা কিছু আমাদের স্বার্থকে পরিতৃপ্ত করে তাই কি ভালো?' প্রশ্নটি একটা উন্মুক্ত প্রশ্ন। কিন্তু যদি 'ভালোত্ব' এবং 'স্বার্থ পরিতৃপ্ত' একই জিনিস হয় তাহলে বাক্যটি এমন হয়: 'যেসব জিনিস আমাদের স্বার্থকে পরিতৃপ্ত করে তাইই আমাদের স্বার্থকে পরিতৃপ্ত করে।' অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে, 'ভালোত্ব'কে যদি আমরা এভাবে 'আমাদের স্বার্থের পরিতৃপ্তি'র সাহায্যে সংজ্ঞায়ন করি তাহলে তা পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হবে। আলোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি বলেন, সাময়িকভাবে যদি আমরা 'ভালোত্ব'কে 'আমাদের স্বার্থের পরিতৃপ্তি' দ্বারা সংজ্ঞায়নের প্রচেষ্টাকে স্বীকারও করে নিই, সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন উন্মুক্ত থেকে যায়– তাহলে স্বার্থের পরিতৃপ্তিই কি শুধু ভালো? 'দরিদ্রকে সাহায্য করা কি ভালো নয়?' এভাবে অসংখ্য উন্মুক্ত প্রশ্নের ধারা উপস্থিত হবে। সুতরাং ভালোত্বের সংজ্ঞায়নের যেকোন প্রচেষ্টাই ত্রুটিপূর্ণ। কিংবা ভালোত্বকে সংজ্ঞায়ন করতে গেলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরেকটি প্রশ্ন উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই ম্যুরের সিদ্ধান্ত হচ্ছে নৈতিক প্রকৃতিবাদ যথার্থ নয়।

কিন্তু ম্যুরের যুক্তিগুলো কি যথার্থ? এটা নির্ভর করছে আমরা প্রকৃতিবাদকে কীভাবে গ্রহণ করছি বা ব্যাখ্যা করছি তার উপর। উদাহরণস্বরূপ, 'ভাল' শব্দটির অর্থ 'আমাদের স্বার্থের পরিতৃপ্তি'। যদি প্রকৃতিবাদকে আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করি সেক্ষেত্রে ম্যুরের যুক্তিসমূহ বিশ্বাসযোগ্য হবে। কিন্তু নৈতিক প্রকৃতিবাদকে আমরা ভিন্নভাবে 'ভালোত্ব কী' সম্পর্কিত ধারণা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি যা 'আমাদের স্বার্থের পরিতৃপ্তি কিসে হয়' এই ধারণার সাথে অভিন্ন। ম্যুরের যুক্তিগুলো এই ধারণাকে আদৌ স্পর্শ করেনি। যদি ম্যুরের যুক্তিগুলো যথার্থ হতো তাহলে তাঁকে দেখানো উচিত ছিল যে, শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা এক ও অভিন্ন। যদি আমরা উক্ত 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' পদ দুটির প্রতি

মনোনিবেশ করি তাহলে দেখতে পাই যে, তারা অভিন্ন নয়। প্রথমটা অর্থাৎ শুকতারা হচ্ছে সেই তারা যা ভোরের আকাশে দেখা যায়, দ্বিতীয় তারা অর্থাৎ সন্ধ্যাতারা দেখা যায় সন্ধ্যার আকাশে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– শুকতারা কি সন্ধ্যাতারা? এটা একটা উন্মুক্ত প্রশ্ন যা বহু শতাব্দী ধরে মানুষের কাছে অজানা ছিল। কিন্তু বস্তুত দুটি তারা একই। অর্থাৎ যা পানি তা-ই H_2O। সুতরাং নৈতিক প্রকৃতিবাদ যাই হোক না কেন ম্যুরের যুক্তিগুলো নিঃসন্দেহে বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কিত নিবন্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাছাড়া আরও অনেক দার্শনিক নৈতিক প্রকৃতিবাদ সম্পর্কে বিধ্বংসী মনোভাব পোষণ করে থাকেন। David Hume ই প্রথম অনুধাবন করেন যে 'হয়'(is) থেকে 'ঔচিত্য'(ought) নিঃসৃত হতে পারে না। আধুনিক নীতিদর্শনের অত্যন্ত বিখ্যাত একটি গ্রন্থ যেখানে হিউম লিখেছেন:

"In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remarked, that the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations concerning human affairs; when of a sudden I am surprised to find, that instead of the usual copulations, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, it"s necessary that it should be observed and explained; and at the same time that a reason should be given, for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from it."[৬]

Max Black[৭] হিউমের এই ধারণাটিকে Hume's Guillotine নামে অভিহিত করেন। হিউম যে বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, তথ্যমূলক অবধারণ এবং মূল্যায়নমূলক অবধারণ মৌলিকভাবে পৃথক, এবং কোন বিশুদ্ধ তথ্যমূলক অবধারণ যৌক্তিকভাবে কোন মূল্যায়নমূলক অবধারণকে নিঃসৃত করে না। মনে করা হয় যে, যদি এটা সত্য হয় তাহলে প্রকৃতিবাদ অভিযুক্ত হবে। কিন্তু আসলে কি হিউমের উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক? কেননা অনেক সময় আমরা তথ্যমূলক আশ্রয়বাক্য থেকে মূল্যায়নমূলক সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হতে দেখি। P, Q কে নিঃসৃত করবে যদি এবং একমাত্র যদি এমন কোন সম্ভাব্য জগত না থাকে যেখানে P হয় সত্য এবং Q হয় মিথ্যা। কিন্তু নিচের যুক্তিটি বিবেচনা করা যাক:

P. 'ক' নামক কাজটি করা এবং 'ক' নামক কাজটি না করার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, যদি আমরা 'ক' নামক কাজটি সম্পাদন করি, একটি শিশু দীর্ঘদিনের জন্য তীব্র কষ্ট পাবে। এটা ছাড়া আর সবকিছু একই হবে।

Q. সুতরাং 'ক' নামক কাজটি না করাই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হবে।

তাহলে এক্ষেত্রে এটা নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছে যে, যেকোন জগতে যেখানে P সত্য সেখানে Q সিদ্ধান্তটিও সত্য হবে। সুতরাং P, Q কে নিঃসৃত করে। তাহলে কেন দার্শনিকেরা মনে করেন যে, তথ্য এবং মূল্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে বা আদৌ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়?

হিউম নিজেও বিশ্বাস করতেন যে 'হয়' এবং ঔচিত্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা শুধু এই কারণে যে, ঔচিত্য অবধারণগুলো আমাদের আচরণের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু তথ্যমূলক অবধারণগুলো আমাদের আচরণের সাথে সম্পর্কিত নয়। হিউম বলেন:

"Since morals, therefore, have an influence on the actions and affections, it follows, that they cannot be derived from reason; and that because reason alone, as we have already proved, can never have any such influence. Morals excite passions, and produce or prevent actions. Reason of itself is utterly impotent in this particular. The rules of morality, therefore, are not conclusions of our reason."[৮]

যখন একজন ব্যক্তির এমন একটা নৈতিক বিশ্বাস থাকে যে, একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করলে কাজটি সঠিক হবে অথবা ভুল হবে এবং উচিত হবে অথবা উচিত হবে না সেটি জানা যাবে– তখন নিশ্চিতভাবে সেই ব্যক্তি উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আমি বললাম জুয়া খেলা উচিত নয়। তখন কেউ অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করল যে আমি প্রতি শনিবার জুয়া খেলি। তখন আমি একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যাব। এটা থেকে সম্ভাব্য কী কী ঘটনা ঘটতে পারে?

এটা থেকে কয়েকটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত হতে পারে: (১) হতে পারে আমি মিথ্যা বলছি; জুয়া খেলা যে উচিত নয় তা আমি আসলেই বিশ্বাস করি না। হতে পারে আমি তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম অথবা আমি রসিকতা করে তাকে এ কথা বলেছিলাম। (২) অন্য সম্ভাব্য বিষয়টি হচ্ছে, আমি কেবলমাত্র বলতে চেয়েছিলাম যে জুয়া খেলা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ কী মনোভাব পোষণ করেন। অর্থাৎ 'জুয়া খেলা উচিত নয়' বলতে আমি কেবলমাত্র এটা বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, বেশিরভাগ মানুষ এটাকে অনুচিত কাজ বলে মনে করে। এটা দ্বারা আমি আমার নিজস্ব কোন মতামত ব্যক্ত করিনি। (৩) আরেকটি সম্ভাব্য বিষয় হতে পারে যে, আমি নৈতিকভাবে দুর্বল। যদিও আমি জানি এটা উচিত কাজ নয় এবং আমি পণ করেছিলাম জুয়া খেলব না, তবুও যখন শনিবার আসে আমি প্রলোভনে পড়ে আমার পণ রক্ষা করতে পারি না। পরবর্তীতে আমি প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিই। এটার অন্য একাধিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে আমার আচরণ কিছু বিশেষ ব্যাখ্যার দাবি রাখে, অন্যথায় তা বোধগম্য হবে না। আমি বিশ্বাস করি যে জুয়া খেলা উচিত নয়, যদি তা সত্য হয় তাহলে আমি স্বাচ্ছন্দ্যে, খুশির সাথে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া জুয়া খেলতে পারি না এবং এটা আমার আচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমি সবসময় চিন্তা-ভাবনা করে যে কাজটি করি তা যে সবসময় সঠিক হবে এমনটা জরুরি নয়, বরং এটা জরুরি যে আমার অন্তত পক্ষে সঠিক কাজটি করার ব্যাপারে একটু হলেও প্রেষণা থাকতে হবে।

কী করা উচিত? এই সম্পর্কিত বিশ্বাস তখন স্বল্প পরিসরে হলেও অনিবার্যভাবে প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তথ্যমূলক বিশ্বাস ঐ একই পদ্ধতিতে কি তা সৃষ্টি করতে পারে না? ধরা যাক, ঘরে আগুন লেগেছে এবং আমি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমরা বলতে পারি যে, আমি ঘর ত্যাগ করলাম কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, ঘরে আগুন লেগেছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ পর্যাপ্ত নয়। এই ব্যাখ্যার সাথে অবশ্যই আরও একটি বাক্য যোগ করতে হবে তা হচ্ছে: 'আমি পুড়ে যেতে চাই না'। যদি আমার এই আকাঙ্ক্ষা না থাকত তাহলে আগুনের বিষয়টা আমি বিবেচনায়ই নিতাম না। অবশ্যই আমরা মনে করতে পারি যে, উক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে 'আমি আগুনে পুড়ে যেতে চাই না' এই বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই অবশ্যম্ভাব্যতার কারণে উক্ত বিশ্লেষণমূলক অংশের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। তথ্যের জ্ঞান ও যথার্থ মনোভাব একত্রে কার্য সৃষ্টি করে, শুধুমাত্র তথ্যের জ্ঞান একা তা পারে না।

ঠিক এই কারণে হিউম মনে করলেন যে ঔচিত্য অবধারণ তথ্যমূলক অবধারণ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। ঔচিত্য অবধারণ হচ্ছে প্রেরণাদায়ক; কিন্তু তথ্যমূলক অবধারণ তা নয়। কিন্তু এটা ঔচিত্য অবধারণের একটা হতবুদ্ধিকর বৈশিষ্ট্য যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কী এমন জিনিস যা ঔচিত্য অবধারণকে 'কার্য করার অথবা কার্য প্রতিরোধ করার' এমন অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদান করে থাকে? তাদের প্রেষণামূলক আধেয়ের কতটুকু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? হিউম মনে করেন বাস্তবিক অর্থে তা যথেষ্ঠ, এবং আমরা তা ব্যাখ্যা করতে পারি একমাত্র আবেগ বা অনুভূতির সাথে নৈতিক বিশ্বাস কীভাবে জড়িত তা অনুধাবন করার মাধ্যমে। অনুভূতির এককভাবে আচরণের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। যদি নৈতিক বিশ্বাসগুলো অনুভূতির প্রকাশ না হয়, তাহলে নৈতিক বিশ্বাসের যে প্রেষণামূলক শক্তি রয়েছে তা হবে ব্যাখ্যাতীত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা 'ঔচিত্য' থেকে 'হয়' কে নিঃসৃত করতে পারি না এই ধারণার একটা বিস্ময়কর তাৎপর্য রয়েছে। কাজেই কেন 'ঔচিত্য' থেকে 'হয়' নিঃসৃত করা অসম্ভব এটা ব্যাখ্যা করার চেয়ে কীভাবে 'ঔচিত্য' থেকে 'হয়' নিঃসৃত করা সম্ভব সেটা ব্যাখ্যা করাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। Max Black একটা যুক্তির সাহায্যে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করেন:

প্রথম আশ্রয়বাক্য : Fischer চায় Botwinnik কে সঙ্গী হিসেবে পেতে।

দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য: Botwinnik কে সঙ্গী হিসেবে পেতে Fischer এর এক এবং একমাত্র উপায় হচ্ছে রাণীকে অপসারণ করা।

সিদ্ধান্ত : সুতরাং Fischer এর উচিত রাণীকে অপসারণ করা।

Black বলেন যে, এটি একটি বৈধ যুক্তি প্রক্রিয়া। আর বৈধ যুক্তির ক্ষেত্রে যদি আশ্রয়বাক্যগুলো সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আশ্রয়বাক্যগুলো তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। আশ্রয়বাক্যগুলোতে কোনো ঔচিত্য অবধারণ নেই। কিন্তু সিদ্ধান্তবাক্য হচ্ছে 'কী করা উচিত' জাতীয় ঔচিত্য অবধারণ। কাজেই এই যুক্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা 'হয়' থেকে 'ঔচিত্য'কে নিঃসৃত করতে পারি।[৯]

কেউ উপরি-উক্ত যুক্তিতে সূক্ষ্ম যৌক্তিক ভ্রান্তি দেখাতে পারেন। ভ্রান্তিটি হচ্ছে, যুক্তিটির সিদ্ধান্ত 'সুতরাং Fischer এর উচিত রাণীকে অপসারণ করা' না হয়ে এরকম হতে পারত যে, 'সুতরাং Fischer চায় রাণীকে অপসারণ করতে'। কেননা যুক্তিটির প্রধান আশ্রয়বাক্যের একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে Fischer কী চায়, Fischer এর কী করা উচিত তা কিন্তু নয়। তাই যুক্তিটিকে অবৈধ বলা যেতে পারে এই কারণে যে, আশ্রয়বাক্যে যে প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি সিদ্ধান্তে তার উপস্থিতি থাকতে পারবে না। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত কখনই আশ্রয়বাক্যকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না। কিন্তু যুক্তিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, আশ্রয়বাক্যে উচিত কিংবা অনুচিত এ প্রসঙ্গে কিছুই উল্লেখ নেই, অথচ সিদ্ধান্ত হয়েছে ঔচিত্যমূলক যা সহানুমানের মৌলিক নিয়মের ব্যত্যয়। অথবা কেউ বলতে পারেন, উক্ত যুক্তির আশ্রয়বাক্যে কী করা উচিত জাতীয় একটি বাক্য যোগ করতে হবে। যেহেতু আশ্রয়বাক্য ঔচিত্যমূলক না হলে সিদ্ধান্ত ঔচিত্য বাক্য হতে পারে না- এই নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে যুক্তিটি নিম্নরূপে লেখা যেতে পারে:

প্রথম আশ্রয়বাক্য : Fischer এর উচিত Botwinnik কে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া।

দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য: Botwinnik কে সঙ্গী হিসেবে পেতে Fischer এর এক এবং একমাত্র উপায় হচ্ছে

রাণীকে অপসারণ করা।

সিদ্ধান্ত : সুতরাং Fischer এর উচিত রাণীকে অপসারণ করা ।

কিন্তু এখানে প্রথম আশ্রয়বাক্যে লক্ষণীয় যে, 'Fischer এর উচিত Botwinnik কে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া' নিশ্চিতভাবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কেননা কাউকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া না পাওয়ার সাথে উচিত কিংবা অনুচিত কোনভাবেই সম্পর্কিত হতে পারে না, এটা সম্পূর্ণভাবে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। যদি এই দ্বিতীয় যুক্তিটি বৈধও হয়, তাহলে তার দ্বারা প্রথম যুক্তিটি যে অবৈধ তা কীভাবে দেখানো যাবে? কেন প্রথম যুক্তিটিও দ্বিতীয় যুক্তিটির মত বৈধ নয়?

এখন আমরা দেখব Max Black এর উদাহরণ কেন ঔচিত্য অবধারণ, যুক্তি এবং পছন্দসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে কাজ করে। 'কী করা উচিত' সম্পর্কিত যেকোন অবধারণেরই তার নিজেকে সমর্থনের জন্য সামর্থনিক যুক্তির প্রয়োজন। যদি আমি বলি যে, তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, তখন সে বলতে পারে কেন? যদি কোন কারণ বা যুক্তি আমি তাকে দেখাতে পারি তাহলে

সে আমার পরামর্শ মানবে না, এটা সাধারণত হতে পারে না। ধরা যাক, আমি তাকে বললাম যে, ঘরে আগুন লেগেছে। সেটা একটা কারণ হতে পারে; এবং সে যদি আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলে সে মুহূর্তের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে কোন দ্বিধা করবে না। কিন্তু এটা আদৌ তার জন্য কোন কারণ বা যুক্তি হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে তার মনোভাবের উপর। যদি সে আগুনে পুড়ে যেতে না চায়, কেবল তখনই ঘরে আগুন লাগার বিষয়টা তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একটা কারণ হবে। কিন্তু যদি সে আগুনে পুড়ে যাওয়ার বিষয়টাকে পাত্তা দিতে না চায়, যা সাধারণত ঘটে না, কেবল সেক্ষেত্রেই ঘরে আগুন লাগার বিষয়টা তার কাছে গুরুত্ব পাবে না। তাই তখন এটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন কারণ হিসেবে তার সামনে আবির্ভূত হবে না।

আরও একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। ধরা যাক, ক এবং খ একটি সিনেমা হলে বসে আছে; তারা 'হারানো সুর' নামক সিনেমাটি দেখতে এসেছে। ক বুঝতে পেরেছে যে তারা ভুল সিনেমা হলে চলে এসেছে। সুতরাং ক বলল, আমাদের অন্য সিনেমা হলে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেন? কেননা 'হারানো সুর' এই সিনেমা হলে দেখানো হবে না। তাহলে এক্ষেত্রেও খ এর বেরিয়ে যাওয়ার কারণ একটাই যদি খ উক্ত সিনেমাটি দেখতে চায়। আর যদি কী সিনেমা দেখানো হবে সে ব্যাপারে খ এর কোন পছন্দ-অপছন্দ না থাকে তাহলে এটা তার জন্য ঐ সিনেমা হলটি ত্যাগ করার কোনো কারণ হিসেবে আবির্ভূত হবে না।

উপরোক্ত উদাহরণগুলো ব্যবহারিক যুক্তির একটি অত্যন্ত সাধারণ ধরনকে ব্যাখ্যা করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি করে অবধারণ পাওয়া যায় তাহলো– কী করা উচিত (তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, আমাদের অন্য থিয়েটারে যাওয়া উচিত) এবং সাথে সাথে এটা কেন করা উচিত তার স্বপক্ষে একটা কারণ বা যুক্তিও সরবরাহ করা হয়েছে (ঘরে আগুন লেগেছে, 'হারানো সুর' সিনেমাটি অন্য সিনেমা হলে দেখানো হচ্ছে)। লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কোন ইচ্ছা বা অভীপ্সা আছে (উক্ত যুক্তি দুটির ক্ষেত্রে নিরাপদ থাকা এবং 'হারানো সুর' সিনেমা দেখা), এই ইচ্ছা বা অভীপ্সাই বলে দেয় কেন উল্লিখিত কারণগুলো তাদের ঐ ধরনের কাজ করার পিছনে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এখানে কোনো আভ্যন্তরীণ রহস্য বা অস্পষ্টতা নেই, তাহলে কেন নিম্নোক্ত আকারের যুক্তিগুলো বৈধ হবে না:

যুক্তি: ১

প্রথম আশ্রয়বাক্য : তুমি আগুনে পুড়তে চাও না।

দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য: ঘরে আগুন লেগেছে এবং তোমার আগুনে পুড়ে যাওয়া পরিহার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

সিদ্ধান্ত : সুতরাং তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

যুক্তি: ২

প্রথম আশ্রয়বাক্য : ক ও খ 'হারানো সুর' সিনেমা দেখতে চায়।

দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য : ক ও খ এর 'হারানো সুর' সিনেমা দেখার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই সিনেমা হল ত্যাগ করে অন্য সিনেমা হলে যাওয়া।

সিদ্ধান্ত : সুতরাং ক ও খ এর অন্য সিনেমা হলে যাওয়া উচিত।

একটি তথ্য এখানে যোগ করা প্রয়োজন। কেননা এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করারও সুযোগ আছে। কারণ ১ম যুক্তির ক্ষেত্রে 'তোমার ঘর ত্যাগ করা কেন উচিত নয়' এবং ২য় যুক্তির ক্ষেত্রে 'কেন ক ও খ এর অন্য সিনেমা হলে যাওয়া উচিত নয়' সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

আবার উদাহরণস্বরূপ হতে পারে, ক ও খ এর অন্য সিনেমা হলে যাওয়া উচিত নয় কারণ সেখানে একজন বিকারগ্রস্ত লোক গুলিবর্ষন করছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র 'হারানো সুর সিনেমাটি দেখার জন্য তাদের পরবর্তী সিনেমা হলে যাওয়া উচিত' এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা উচিত হবে না। তাহলে এই নতুন তথ্য দিয়ে আমরা নতুন আরেকটি যুক্তি গঠন করতে পারি:

প্রথম আশ্রয়বাক্য : ক ও খ গুলিবিদ্ধ হতে চায় না।

দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য : পরবর্তী সিনেমা হলে একজন বিকারগ্রস্ত লোক গুলিবর্ষণ করছে।

সিদ্ধান্ত : সুতরাং ক ও খ এর পরবর্তী সিনেমা হলে যাওয়া উচিত নয়।

সব পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক ও খ এর পরবর্তী সিনেমা হলে যাওয়া উচিত কি না এই সিদ্ধান্তটি নির্ভর করবে তারা সিনেমাটি দেখা বাদ দিবে নাকি গুলিবিদ্ধ হবে তার উপর।

Black এর উদাহরণগুলো প্রায়োগিক যুক্তির ঐ একই বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহার করে গঠিত হয়। তাঁর উদাহরণে বলা হয়েছে যে, Fischer এর উচিত রাণীকে অপসারণ করা, এই অবধারণটি সত্য হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যদি এটির সমর্থনে কোন শুদ্ধ যুক্তি থাকে (কারণ রাণীকে অপসারণ করাই Botwinnik কে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার একমাত্র পথ)। চূড়ান্তভাবে উক্ত যুক্তির প্রাসঙ্গিকতা সুরক্ষিত হবে যদি Fischer এর উল্লিখিত মনোভাব (সে Botwinnik কে সঙ্গী হিসেবে পেতে চায়) থাকে। যদি Fischer Botwinnik কে সঙ্গী হিসেবে চায়, সেটাই তার জন্য রাণীকে অপসারণ করার পক্ষে একটা ভালো যুক্তি হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং এটা থেকে নিঃসৃত হয় যে, তার রাণীকে অপসারণ করা উচিত।

কাজেই কখনই 'হয়' মূলক অবধারণ থেকে 'ঔচিত্য' মূলক অবধারণ নিঃসৃত করা যায় না বলে হিউম যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা যথার্থ নয়। তার বক্তব্য সঠিক নয় একটি কারণে তা হলো : তিনি তাঁর নিজের বিশ্লেষণকে পরিত্যাগ করেছেন। যদি কোন যুক্তির আশ্রয়বাক্যসমূহে একজন ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অভীপ্সা সংযুক্ত থাকে, তাহলে তা থেকে আমরা বৈধভাবে একজন ব্যক্তির 'কী করা উচিত' এই জাতীয় সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করতে পারি। কিন্তু হিউম এর বক্তব্যে তা প্রতিফলিত হয়নি। "কীভাবে জগত স্বতন্ত্রভাবে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যান্য মনোভাবকে সংযুক্ত করে সেই সম্পর্কিত তথ্য থেকে আমরা ঔচিত্য অবধারণকে নিঃসৃত করতে পারি না"- প্রকৃতপক্ষে হিউম এর দৃষ্টিভঙ্গিকে উক্ত ধারণা হিসেবে প্রকাশ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। এটাই হচ্ছে "Hume's Guillotine" এর মূল আলোচ্য বিষয়।[১০]

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুদ্ধির প্রকৃতিবাদী তত্ত্বের প্রাথমিক স্তরটি পেয়েছি। এই তত্ত্বানুসারে, মনোভাব স্বয়ং কারণ নয়, কিন্তু মনোভাব এটা ব্যাখ্যা করে যে তথ্য কীভাবে আমাদের কারণের যোগান দেয়। পূর্বোক্ত উদাহরণে 'তার ঘরটি ত্যাগ করা উচিত' এর পেছনের কারণটি খুবই সাধারণ, কেননা ঘরে আগুন লেগেছে। এক্ষেত্রে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে আগুনে পুড়ে যাওয়া পরিহার করার জন্য ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছে যে, ঘরে আগুন লাগলে কেন উক্ত ঘরে নির্বিকার বসে থেকে আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

অনেক সময় 'অনুসৃত কারণ'কে একজন ব্যক্তি ইতোমধ্যে কী সম্পাদন করতে চায় তা সম্পাদন করার যথাযথ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উপরোক্ত আগুন লাগার ঘটনা এবং 'হারানো সুর' সিনেমাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উক্ত উদাহরণগুলোতে এটা প্রতিফলিত হয় যে, আমরা এরকম সিদ্ধান্ত নিতে প্রলুব্ধ হতে পারি যে, কারণ আমাদেরকে কেবলমাত্র লক্ষ্যের দিকেই ধাবিত করে যা ইতোমধ্যে প্রাক্-অস্তিত্বশীল মনোভাব কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে আছে। আমরা একে বলতে পারি সরল ছবি (simple

picture)। এই সরল ছবি অনুসারে আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই এক সেট করে মনোভাব আছে যা 'আগে থেকেই প্রদত্ত', বিশেষ করে চিন্তা ও ভাবনা। আমরা কিছু জিনিস চাই (অথবা অনুমোদন করি না কিংবা তাদের সম্বন্ধে যত্নবান হই না)। তখন কারণই আমাদের বলে দেয় উক্ত মনোভাবগুলোকে পরিতৃপ্ত করতে আমাদের কোন কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে।[১১] হিউম সম্ভবত এই সরল ছবি ধারণাকেই গ্রহণ করে বলেছিলেন যে, "Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than to serve and obey them".[১২]

কিন্তু এই সরল ছবিতত্ত্ব যথার্থ নয়। কেননা পারিপার্শ্বিক তথ্যের মাধ্যমে চিন্তন প্রক্রিয়ায় কোন একটি বিষয় একজন ব্যক্তির মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে। পারিপার্শ্বিক তথ্যের মাধ্যমে চিন্তন প্রক্রিয়া ব্যক্তির যে অনুভূতি বর্তমান আছে তাকে শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু এটা আবার অনুভূতিকে দুর্বল করতে পারে, মার্জিত করতে পারে অথবা অন্তর্হিতও করতে পারে। এবং তা অন্যান্য নতুন অনুভূতি গঠনও করতে পারে। কাজেই আমাদের জ্ঞানজ ক্ষমতা আমাদের আকার-আকৃতি, গঠন ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণে আমরা দেখেছি যে, একজন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের মনোভাব থাকতে পারে। যেমন– সিগারেট খাওয়ার প্রতি ভালোবাসা, কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি ঘৃণা এবং কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সে অবদান রাখুক এটা কেউ আশা করুক এটার প্রতি তার বিরক্তিভাব থাকতে পারে। কিন্তু যদি সে কিছু বিষয় সম্বন্ধে স্বেচ্ছায় একটু গুরুত্বসহকারে চিন্তা করে তাহলে তার মনোভাবে পরিবর্তন আসতে পারে- যেমন– সে যদি বিবেচনা করে যে সিগারেট পান তার জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে, কৃষ্ণাঙ্গরাও মানুষ এবং জগতের অন্যান্য মানুষের মত তাদের মধ্যেও ভাল বা খারাপ মানুষ আছে, সেখানে অনেক শিশু অভুক্ত আছে তাই দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করা ভাল। এভাবে তার মনোভাবে পরিবর্তন আসতে পারে।

তবে পারিপার্শ্বিক তথ্যের মাধ্যমে চিন্তনের বিষয়টা অতটা সরল নয়। Aristotle থেকে শুরু করে বিভিন্ন দার্শনিকেরা এ ব্যাপারে জোর দিয়েছেন যে, তথ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও একজন ব্যক্তি কতটুকু জানতে পারছে তার নিহিতার্থ সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য অন্য একটি জ্ঞানজ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এটা শুধু যে তথ্যকে জানার জন্য আবশ্যক তা নয়, বরং ব্যক্তির মনের মধ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদেরকে নিরপেক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে পুনরাবৃত্তি করার জন্য উক্ত জ্ঞানজ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এরিস্টটল এক্ষেত্রে দুই ধরনের জ্ঞানের কথা বলেন: (ক) কোন ব্যক্তির তথ্য সম্বন্ধে এমন জ্ঞান আছে যে নাকি একজন মাতাল ব্যক্তি যেমনভাবে এম্পিডক্লিসের কবিতা কোন অর্থ না বুঝে বিড় বিড় করে আবৃত্তি করতে পারে তেমনিভাবে তথ্যকে আবৃত্তি করতে সক্ষম। (খ) এমন ধরনের জ্ঞান যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কী জানে সে সম্বন্ধে সচেতনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম।[১৩] উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, পৃথিবীতে অনেক শিশু অনাহারে এবং চিকিৎসার অভাবে সহজে নিরাময়যোগ্য এমন রোগে মারা যায়। যদিও আমরা জানি, এই ঘটনা আমাদের বেশিরভাগ মানুষের মনে কোনো প্রভাব ফেলে না। আমরা তুচ্ছ কাজের জন্য অর্থ খরচ করি, কিন্তু তাদের সাহায্য করি না। এটাকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? এরিস্টটলীয় বিশ্লেষণ হচ্ছে এক্ষেত্রে অনেক শিশুর মরে যাওয়ার বিষয়টা আমরা জানি, একজন মাতাল ব্যক্তি এম্পিডক্লিসের কবিতা যেভাবে জানে সেরকমভাবে। অর্থাৎ আমরা সচেতনভাবে, আন্তরিকতার সাথে বিষয়টা উপলব্ধি না করে শুধু বাহ্যিকভাবে বিষয়টা মুখে মুখে বলি। যদি আমরা সচেতনভাবে চিন্তা করতাম যে, ঐ শিশুরা কী ধরনের জীবন যাপন পছন্দ করে তাহলে আমাদের মনোভাব, আচরণ এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হতে পারত।

কাজেই বলা যায়, নৈতিক অবধারণ মনোভাবকে প্রকাশ করে ঠিকই, কিন্তু যেকোন মনোভাবকে নয়। তারা সেইসব মনোভাবকে প্রকাশ করে যা ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া কর্তৃক আবির্ভূত এবং পরিচালিত হয়। সুতরাং কোনো কাজ নৈতিকভাবে আবশ্যক বলতে বুঝায় এমন একটি বিষয়– যখন আমাদের জ্ঞানজ

সক্ষমতা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে কাজ করে, তখন একজন ব্যক্তি কোন একটি কাজে সাহায্য করতে না পারলেও কাজটির প্রতি অনুমোদনের অনুভূতি অনুভব করে।

এটি আপাতদৃষ্টিতে আপেক্ষিকতাবাদকে আমন্ত্রণ জানায়। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির পছন্দের ধরন বিভিন্ন হতে পারে, তারা যদি অধিক মনোযোগী ও চিন্তাশীল থাকে তারপরও তাদের পছন্দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। একজনের জন্য যেটা পক্ষের যুক্তি হিসেবে কাজ করে অন্যের জন্য সেটা পক্ষের যুক্তি হিসেবে অথবা পক্ষের কারণ হিসেবে কাজ নাও করতে পারে। যাই হোক, প্রকৃতিবাদীরা যেটার উপর জোর দেন তা হচ্ছে, মানুষ একই ধরনের অনেক মূল্য পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করে। কারণ মানুষ তাদের স্বার্থ, প্রয়োজনীয়তা এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে সাধারণত একই ধরনের হয়ে থাকে (এটা একটা অভিজ্ঞতামূলক বিষয় এবং এটা অন্যভাবেও হতে পারে)। এই ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণ করার জন্য প্রকৃতিবাদীরা সকল মানুষ অথবা অন্তত পক্ষে বেশিরভাগ মানুষ তাদের যে সাধারণ স্বভাব-প্রকৃতিগুলো পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করে যা কিনা আমাদের মৌলিক মূল্যগুলোকে জাগ্রত করে, সেই ধারণাকে আহ্বান করে। সেজন্য হিউম বলেন যে: "When you pronounce any action or character to be vicious, you mean nothing, but that from the constitution of your nature you have a feeling or sentiment of blame from the contemplation of it".[১৪]

প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের স্বভাব-প্রকৃতির গঠন প্রণালী কী রকমের এবং কোন্ ধরনের প্রেরণাদায়ী গঠন-প্রণালী এর মধ্যে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে Darwin এর বিবর্তনতত্ত্ব থেকে আমরা মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে সবচেয়ে সমৃদ্ধ তথ্য পেয়ে থাকি। মানব মনস্তত্ত্বের অতি ব্যাপ্তিশীল এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন: আমাদের মনোভাবসমূহ, স্বভাব-চরিত্র এবং জ্ঞানজ প্রক্রিয়াসমূহকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) ফল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কীভাবে উক্ত মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কাজ করে এবং কেন তারা আমাদের মাঝে আছে? এটা আমাদেরকে তা বুঝতে সাহায্য করে। সহজভাবে বলতে গেলে, উক্ত মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (যা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছি) আমাদেরকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে এবং পুনরুৎপাদন করতে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে আমাদের মাঝে সক্রিয় আছে।

উপরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নৈতিক আচরণ তাহলে কী? অত্যন্ত সাধারণভাবে বলা যায়, নৈতিক আচরণ হচ্ছে কল্যাণময় বা পরার্থবাদী আচরণ, যা আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব কল্যাণকেই উন্নত করে না বরং অন্যদের কল্যাণকেও উন্নত করে। একে কি আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল হিসেবে মনে করতে পারি? ডারউইন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বিষয়টা ততটা সরল নয়। এখানে একটি সমস্যা হচ্ছে পরার্থবাদ (Altruism) অন্যের কল্যাণের জন্য কাজ করার কথা বলে তাতে যদি একজনের ক্ষতিও হয় তারপরও। সুতরাং কল্যাণকামী আচরণের প্রবণতা পুনরুৎপাদনশীল সাফল্যের বিরুদ্ধে কাজ করে বলে মনে হয়। একজন পরার্থবাদী অন্যদের সাহায্য করে তাদের টিকে থাকার সুযোগ বৃদ্ধি করে, কিন্তু পাশাপাশি অন্যদের অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে নিজের টিকে থাকার সুযোগকে হ্রাস করে ফেলে। সুতরাং পরার্থবাদী যেকোন প্রবণতাকে পরিহার করতে আমাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনকে প্রত্যাশা করতে হবে।

যাই হোক ডারউইন বলেছেন, 'সামাজিক প্রবণতাসমূহ' (Social Instincts) যা কিনা একজনের ক্ষতির বিনিময়েও অন্যদের সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করে- এটা অবশ্যই শুধুমাত্র মানুষকেই অস্তিত্বশীল করবে না বরং মানুষের মত অন্যান্য প্রাণিদেরকেও অস্তিত্বশীল করবে। পরিবারের সদস্যরা এক অপরের প্রতি যে আচরণ করে তা থেকে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। প্রশ্ন জাগে তাহলে কী কারণে সন্তানের প্রতি পিতামাতার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, যেখানে তাদের এই ত্যাগের ফলে নিজেদের টিকে থাকার সুযোগ কমে যাচ্ছে? ডারউইনের বক্তব্য সেক্ষেত্রে অস্পষ্ট। পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে স্নেহ ও

ভালোবাসার সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ "which apparently lie at the basis of the social affections, it is hopeless to speculate."[১৫]

W. D. Hamilton ১৯৬৪ সালে জ্ঞাতিত্ব নির্বাচনতত্ত্ব (Kin Selection)[১৬] ঘোষণা করার পূর্ব পর্যন্ত মূলত এই রহস্য অমীমাংসিত ছিল। Hamilton এর তত্ত্বটি যে পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে– বহু স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বা (Individuals) বংশানুক্রমিকভাবে সদৃশ। সাধারণভাবে কেউ তার আপন ভাইবোনের সাথে অর্ধেক জিন ভাগাভাগি করে, চাচাত ভাইবোনের সাথে আট ভাগের একভাগ জিন ভাগাভাগি করে এবং এভাবে চলতে থাকে। সুতরাং এভাবে চলতে চলতে একজনের জিন বংশানুক্রমিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয়ে তাদের টিকে থাকার সুযোগ বৃদ্ধি করে থাকে। তাই আমরা আশা করতে পারি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রত্যেকের নিকট আত্মীয়ের প্রতি যে পরার্থবাদী প্রবণতা থাকে তাকে সমর্থন করে। যেহেতু আমরা সাধারণভাবে দেখি যে ব্যক্তি তার নিকট আত্মীয়-স্বজনকে অপরিচিত ব্যক্তির তুলনায় বেশি একান্তভাবে কামনা করে থাকে, তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বটি পরার্থবাদী প্রবণতার সাথে বেশ ভালোভাবে মানানসই বলে মনে হয়।

উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখলে পিতা-মাতা এবং ভাইবোনদের মধ্যে যে আত্মোৎসর্গকারী পরার্থবাদিতা পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে কোনো রহস্যময়তা থাকে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে কাজ করে সে ব্যাপারে আমাদের এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এখানে অবশ্য এটা মুখ্য বিষয় নয় যে, ব্যক্তি তাদের জিনের বিস্তার কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সেটা হিসাব করতে বসে যাবে। কেউ নিশ্চয় তা করবে না। এখানে আসল ব্যাপারটা এই যে, এইগুলো হচ্ছে বংশানুক্রমিকভাবে-প্রভাবিত আচরণ যা অন্যান্য সুবিধাভোগী বৈশিষ্ট্যসমূহের মতো একই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হবে।

কিন্তু সকল পরার্থবাদ আত্মীয় বা জ্ঞাতিত্ব পরার্থবাদ নয়। অনেক মানুষের মধ্যে এবং এমনকি প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যেতে পারে যে, তারা অন্যের সাহায্যার্থে নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে, কিন্তু তারা আদৌ তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত নয় এবং তখন এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানীরা পারস্পরিক পরার্থবাদ (Reciprocal Altruism) এর ধারণা প্রবর্তন করেন। এই মতবাদ অনুসারে, ব্যক্তি বা যেকোন প্রাণী অন্যের জন্য কাজ করে এই সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য যে, অন্যরাও প্রয়োজনে তার জন্য অনুরূপভাবে কাজ করবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বানর আরেকটি বানরের শরীরের পেছন দিক থেকে পোকামাকড় জাতীয় পরজীবীদের বেছে পরিষ্কার করে দেয় এবং এর বিনিময়ে সেও উক্ত সুবিধা পায়। তাহলে খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা যখন একটা দলের সকল সদস্যরা চর্চা করবে তখন তার সুবিধা সবাই পাবে। কিন্তু বিষয়টা অতটা সহজ নয়। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতি অনুযায়ী, এই ধরনের সহযোগিতামূলক আচরণকে প্রথমেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সম্ভবত আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব যদি আমরা ডারউইনীয় "টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম" (Struggle for Survival) তত্ত্বটিকে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচনা করি। তখন আমরা যুক্তি দিতে পারব যে, সামাজিক সহযোগিতা কোন দলের সদস্যদের এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দিয়ে থাকে। আমরা বলতে পারব যে, দলের যেসব সদস্যরা পারস্পরিক সহযোগিতা করে, যারা এটা করে না তাদের চেয়ে তারা বেশি দিন টিকে থাকে এবং বেশি বংশবৃদ্ধি করবে। কিন্তু ডারউইন থেকে বর্তমান পর্যন্ত 'টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম' কথাটা বিবেচিত হয়েছে ব্যক্তি বা স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে সংগ্রাম হিসেবে, বিভিন্ন দলের মধ্যে সংগ্রাম হিসেবে নয়। ডারউইন বলেন, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, 'we are not here speaking of one tribe being victorious over another.' [১৭] কিছু সমালোচক প্রাকৃতিক নির্বাচনের একক হিসেবে স্বতন্ত্র সত্তাকে

এতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার মধ্যে কোন ন্যায্যতা দেখতে পাচ্ছেন না। R. C. Lewontin এটাকে নিছক ভাষাদর্শগত গোঁড়ামি বিষয়ক প্রবন্ধ বলে মনে করেন। তিনি বলেন, বস্তুত বর্তমানে বিবর্তনের যেকোন ছাত্রই মনে করে যে, স্বতন্ত্র জীব হচ্ছে সেই বস্তু যাকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা সরাসরি দেখা যায়। Lewontin বলেন:

"What is being explicitly denied is that characteristics favorable to the population as a whole will evolve by natural selection, except as a secondary consequence of the greater fitness of individuals over others within the population. So, for example, we are not allowed to claim that linguistic communication between humans was favored by natural selection by arguing that a group of protohumans who could talk to each other would be at an advantage in warfare or hunting over other groups who were without language." [১৮]

এদিকে অপ্রত্যাশিত একটি উৎস থেকে উক্ত সমস্যার আরেকটি সমাধান বেরিয়ে এসেছে। সেটি হচ্ছে 'বন্দীর উভয়সংকট' (The Prisoner's Dilemma) মতবাদ যা প্রণয়ন করেন একজন ক্রীড়া মতবাদী (Game Theorist)। এই 'বন্দীর উভয়সংকট' মতবাদটির বিস্ময়কর ব্যবহার লক্ষ করা যায় বিভিন্ন নৈতিক মতবাদে এবং এটি পারস্পরিক পরার্থবাদ মতবাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে।

'বন্দীর উভয়সংকট' মতবাদ হচ্ছে, দুইজন অপরাধীকে গ্রেফতার করে জেলখানার দুই কক্ষে বন্দি করে রাখা হল। তাদের দুইজনকে আলাদাভাবে দুটি বিকল্প দেয়া হল। দুজনকে দুটি বিকল্পের যেকোন একটিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, হয় সে দোষ স্বীকার করবে অথবা দোষ অস্বীকার করবে। এক্ষেত্রে একজন জানবে না অন্যজন কী করছে। প্রত্যেক বন্দীর ক্ষেত্রে দোষ স্বীকার করার জন্য যে প্রতিদান তার চেয়ে দোষ অস্বীকার করার জন্য প্রতিদান বেশি পাবে। এক্ষেত্রে অন্যজন কী করছে সেটা কোন বিষয় নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে বন্দী বেশি লাভ করতে চাইবে সে অবশ্যই দোষ অস্বীকার করার পথ বেছে নিবে। কিন্তু যদি দুজনেই দোষ অস্বীকার করে, তাহলে দুজনই দোষ স্বীকার করলে যে প্রতিদান পেত তার চেয়ে কম প্রতিদান পাবে। প্রতিদানের নিয়মটা নিচে দেয়া হলো:

উভয়ই স্বীকার করলে: উভয়ই পাবে ৩

উভয়ই অস্বীকার করলে: উভয়ই পাবে ১

একজন স্বীকার এবং অন্যজন অস্বীকার করলে: অস্বীকারকারী পাবে ৫ এবং স্বীকারকারী পাবে ০।

কাজেই প্রত্যেকেই দোষ অস্বীকার করতে প্রলুব্ধ হবে কারণ সে সর্বোচ্চ প্রতিদান পেতে চায়। যদি একজন অস্বীকার করে এবং অন্যদিকে তার দুষ্কর্মের সহযোগী স্বীকার করে তাহলে সে সর্বোচ্চ প্রতিদান পেতে পারে। একই সময়ে আবার দুজনেই দোষ স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছে, কারণ যদি অন্য সহযোগী অস্বীকার করে তাহলে স্বীকারকারী বন্দীর শূন্য প্রতিদান পেতে হবে। তবু উভয়ের জন্য উত্তম হচ্ছে, দোষ অস্বীকার করার চেয়ে দোষ স্বীকার করা।

'বন্দীর উভয়সংকট' মডেলটি সামাজিক সহযোগিতার প্রশ্নে একটি গভীরতর সমস্যা সৃষ্টি করে। বানরদের যারা একে অপরের পৃষ্ঠদেশ লালন করে, তাদের মতো আমরাও সবাই একা থাকার চেয়ে বরং একে অপরের সহযোগিতার দ্বারা বেশি উপকৃত হব। যদি আমাদের মধ্যে কেউ একজন 'মুক্ত চালকের' মতো পারস্পরিক সহযোগিতা না করেও অন্যদের থেকে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগও করেন, তারপরও আমরা উপকৃত হব এবং অনেক বেশি ভাল থাকব তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নীতিবিদরা বিভিন্ন কারণে উক্ত উভয়সংকট সমস্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়েছেন। চুক্তিতত্ত্ববিদরা যাঁরা মনে করেন, নৈতিক চাহিদাসমূহের উৎপত্তি হয় পারস্পরিক আত্মস্বার্থের চুক্তি হতে। তাঁরা বলেন, 'বন্দীর উভয়সংকট' মতবাদ সেই সামাজিক পরিস্থিতির ধারণাকে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করে যে সামাজিক অবস্থা নৈতিকতার সাথে আমাদের চুক্তিকে দাবি করে। প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্যরা এই নিয়মকে যথাযথভাবে মান্য করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে রাজি, যেমন– সত্য বলার মাধ্যমে, অন্যের ক্ষতি না করার মাধ্যমে ইত্যাদি।[১৯] উপযোগবাদীরা বলেন, অন্যদের সাথে আমাদের আচরণ এমন হবে যেন আমরা সবসময় কামনা করি সবাই যথাসম্ভব ভাল থাকুক।

প্রায়শই দেখা যায় দার্শনিক মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক শেষ পর্যন্ত উক্ত মতবাদের হালকা ছদ্মবেশী বর্ণনার বেশি কিছু নয় এবং জিদ ধরে বলা হয় যে এটা সত্য নয়। প্রকৃতিবাদীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অবস্থার শিকার।

৪. নৈতিক প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা:

নৈতিক প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হচ্ছে– এটি আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার অবয়বকে পরিহার করেছে। যেহেতু নীতিবিদ্যার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে কার্যকে পরিচালনা করা, তাই এখানেই গুরুতর অভিযোগের কারণটি নিহিত। অভিযোগগুলি বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

প্রথমত, বলা হয়ে থাকে যে, আমরা 'হয়' থেকে 'ঔচিত্য'কে নিঃসৃত করতে পারি না যেটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নৈতিক গুণগুলো হচ্ছে আদর্শনিষ্ঠ গুণ এবং এগুলোর নিজের মধ্যেই 'ঔচিত্য' ধারণ করে। তাই যদি কোন কাজের মধ্যে ভালত্বের বা ন্যায্যতার গুণ থাকে তাহলে যেকোন ব্যক্তির সেই কাজটি করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতিবাদীরা যে প্রাকৃতিক গুণের কথা বলেন তার মধ্যে আদর্শনিষ্ঠতা নেই।

দ্বিতীয়ত, নৈতিক পদকে প্রাকৃতিক প্রত্যয়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা সব সময় সফল নাও হতে পারে। কারণ এমনও হতে পারে, একটি কাজ ন্যায্য বা ভাল কিন্তু তার কোন প্রাকৃতিক গুণাবলি নেই, আবার এমনও হতে পারে, একটি কাজের প্রাকৃতিক গুণাবলি আছে কিন্তু সেটি সঠিক নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, 'ক হয় ভাল' কেউ এই নৈতিক উক্তিকে প্রাকৃতিক উক্তির সাহায্যে এভাবে প্রকাশ করতে পারে– 'ক' হয় ভাল কেননা বেশিরভাগ মানুষ 'ক' কে অনুমোদন করে। এই রূপান্তরকরণ অপর্যাপ্ত, কেননা বেশিরভাগ মানুষ ভুল করতে পারেন। যদি বেশিরভাগ মানুষ একটি শিশুকে নির্যাতন করে তাহলে এই মতানুসারে সে কাজটি ন্যায্য বা ভাল বলতে হয়, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এটাকে অনুমোদন করলেও কাজটি কোনভাবেই ভাল নয়। আবার কিছু কাজ আছে বেশিরভাগ মানুষ সেটাকে অনুমোদন না দিলেও তা ভালো বা ন্যায্য।

তৃতীয়ত, প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আপত্তি উত্থাপন করেন বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জি. ই. ম্যুর। ম্যুরের মতে, সাধারণত যখন কোন অপ্রাকৃতিক বস্তু বা গুণকে প্রাকৃতিক বস্তু বা গুণের মাধ্যমে সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করা হয় তখন একধরনের অনুপপত্তির উদ্ভব হয়। এই অনুপপত্তির নাম প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি (Naturalistic Fallacy)। তাঁর ভাষায় 'ভালো' একটি অপ্রাকৃতিক গুণ এবং আনন্দ, আনন্দবোধ, ইচ্ছা-পরিতৃপ্তি– এ সমস্তই প্রাকৃতিক গুণ। অতএব, ভাল নামক অপ্রাকৃতিক গুণকে যখন আনন্দ বা ইচ্ছা-পরিতৃপ্তি জাতীয় প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তখন প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি ঘটে। 'ক' নামক কোন ভালো বস্তুর মধ্যে ভালো নামক গুণটি ছাড়া প, ফ, ব... প্রভৃতি অন্যান্য আরও অনেক গুণ থাকতে পারে। কিন্তু ম্যুর বলেন, যখন কোন লোক প, ফ, ব... গুণ দ্বারাই ভালো নামক গুণের সংজ্ঞা দিতে চান তখন তিনি প্রকৃতিবাদী দোষে দোষী হন। তিনি বলেন, যদি কেউ বলে, 'আনন্দ ভালো' তাহলে সেটা দোষের কিছু নয়; অসুবিধা হয় তখনই যখন এই দুই ভিন্ন জাতীয়

গুণকে প্রথমে এক ও অভিন্ন বলে মনে করা হয়, এবং তারপর এক গুণকে অপর গুণ দ্বারা সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের যুক্তি প্রথমত প্রাকৃতিক দোষে দুষ্ট, এবং দ্বিতীয়ত একটি বিশ্লেষণী উক্তি নিজেকে সংশ্লেষণী উক্তি বলে দাবি করে। ম্যুর বলেন, যখন এই দার্শনিকেরা 'আনন্দ ভালো' কথাটা বলেন তখন তারা এই বাক্যটিকে একটি সংশ্লেষণমূলক বাক্য বলেও দাবি করেন, অথচ কিছু আগেই তারা আনন্দ ও ভালোকে এক ও অভিন্ন বলে দাবি করেছেন। সেক্ষেত্রে 'আনন্দ ভালো' বাক্যটি 'আনন্দ আনন্দ' নামক একটা স্বতঃসত্য বাক্য (Tautology) হয়ে দাঁড়ায়, এবং 'আনন্দ ভালো' নামক বাক্যটি নিজেকে আর সংশ্লেষণী বা তথ্যবাহী তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য বলে দাবি করতে পারে না।[২০]

নৈতিক প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে ম্যুর আরও দুটি আনুষঙ্গিক সমালোচনার অবতারণা করেন। প্রথমত 'ভালো' এর যদি প্রকৃতিবাদী সংজ্ঞা দেয়া হয় তাহলে কোনো প্রকৃতিবাদী কখনই দাবি করে বলতে পারেন না যে তাঁর নিজস্ব প্রকৃতিবাদী সংজ্ঞাটিই যথার্থ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সমস্ত প্রকৃতিবাদী সংজ্ঞা ভুল। যেমন: 'ইচ্ছা-পরিতৃপ্তি ভালো' 'আনন্দ ভালো'- ভালো-র এ জাতীয় বিভিন্ন প্রকৃতিবাদী সংজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টা যথার্থ, কোন্‌টা যথার্থ নয় তা মীমাংসা করার কোন উপায় নেই। দ্বিতীয়ত যেহেতু এই সংজ্ঞার মধ্যে 'ভালো' এর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানের প্রতিফলন দেখা যায় না, সেজন্য 'ভালো' হবার জন্য মানুষকে নৈতিক চাপ দেয়াও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভালো বলতে যদি আনন্দই বুঝায়, তাহলে ভালো হবার জন্য মানুষকে কেন ভালো কাজে ব্রতী হতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, তার কোন সদুত্তর তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, নৈতিক উক্তিগুলো পরামর্শমূলক, কিন্তু এদের প্রকৃতিবাদী রূপায়ণগুলো নিছক বর্ণনামূলক।

পঞ্চমত, সমগ্র প্রকৃতিবাদের দিকে দৃষ্টি দাও এবং এর মধ্যে তুমি এমন কিছুই খুঁজে পাবে না যা তোমাকে বলবে যে তোমাকে কী করতে হবে।

উক্ত অভিযোগগুলো কী যথার্থ? একদিকে প্রকৃতিবাদের যে বর্ণনা আমরা দেখেছি সেখানে আদর্শনিষ্ঠ উপাদানগুলোকে সংযুক্ত করা হয়। নৈতিক যুক্তির সাথে আমাদের পছন্দসমূহ জড়িত। বস্তুর নৈতিক গুণসমূহের যে শক্তি রয়েছে তা এই পছন্দসমূহকে প্রভাবিত করে। সুতরাং নীতিবিদ্যার আদর্শনিষ্ঠ অবয়বের কিছু বিশ্লেষণ আমাদের আছে। তারপরও এটা কোনভাবেই অভিযোগ ঘুচানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

কেন এই অভিযোগ জিইয়ে আছে তার কিছু কারণ অনুসন্ধান করেন Thomas Nagel। তিনি বলেন, আমরা আমাদের নীতিবিদ্যার প্রকৃতিবাদী তত্ত্বের সাথে অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃতিবাদী তত্ত্বকে তুলনা করতে পারি, যেমন গণিতের সাথে। তিনি বলেন, কেন ফ্রেগে গণিতের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অভিযুক্ত করেছিলেন? কারণ ফ্রেগে মনে করতেন, গণিত হচ্ছে তার নিজস্ব সত্যতার আদর্শের ভিত্তিতে নিজেই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়। তিনি Euclid এর বিখ্যাত প্রমাণ মৌলিক সংখ্যা অসীম সংখ্যক, সেটা বিবেচনা করেন:

তোমার পছন্দমত যে কোন মৌলিক সংখ্যার তালিকা লও, এবং তাদেরকে একসাথে গুণ কর। তারপর তার সাথে এক যোগ কর। ফলাফলকে n নাম দাও। এই n কে তোমার নেওয়া মৌলিক সংখ্যার তালিকার কোন সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় না, কারণ সবক্ষেত্রেই সবসময় ১ অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং হয় n নিজে একটা মৌলিক সংখ্যা, অথবা তা এমন কোনো কোনো মৌলিক সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য যা তোমার তালিকায় নেই। যেহেতু এটা সত্য, তাই তুমি মৌলিক সংখ্যার কোন্ তালিকা নিয়ে শুরু করেছ এটা কোনো বিষয় নয়, বরং এটা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মৌলিক সংখ্যা অসীম সংখ্যক।

ইউক্লিড এর এই যুক্তি যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, মৌলিক সংখ্যা অসীম সংখ্যক। কিন্তু এখানে লক্ষ করার বিষয় যে, এই যুক্তি কারো জ্ঞানজ ক্ষমতা, কারো মস্তিষ্ক, কারো শিক্ষা, কারো গাণিতিক বিশ্বাস, ইংরেজি ভাষা অথবা ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কারো জ্ঞান থাকা না-থাকা কোনো কিছুকেই সম্পৃক্ত করে না। এবং এটা প্রমাণের জন্য উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন তথ্যেরও প্রয়োজন নেই। যুক্তিটি নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ের তথ্য জানা না থাকলেও 'মৌলিক সংখ্যা যে অসীম সংখ্যক'- এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন সন্দেহ তৈরি করতে পারে না। এই যুক্তিটির ইতি টানতে উক্ত প্রমাণের মধ্যেই কোন ভুল আছে সেটা দেখাতে হবে। Nagel বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আমাদের আলোচ্য বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত প্রমাণই যথেষ্ট।[২১]

এখন উক্ত উদাহরণকে নৈতিক যুক্তির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যাক:

যদি আমরা কোনো অনুভূতিনাশকের ব্যবস্থা ছাড়াই কোন শিশুর অপারেশন সম্পন্ন করি তাহলে সে নিদারুণ যন্ত্রণা পাবে।

অনুভূতিনাশকটি তার শরীরে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না; এটা সাময়িক সময়ের জন্য তাকে অচেতন এবং ব্যথার প্রতি অনুভূতিহীন করবে।

সুতরাং তাকে অপারেশনের আগে অনুভূতিনাশক দেয়া উচিত।

যদি আমরা এই যুক্তির মধ্য দিয়ে চিন্তা করি এবং যুক্তিটি বুঝি, তাহলে আমরা সহজেই জানতে পারি যে, শিশুটিকে আগে অনুভূতিনাশক দেওয়া উচিত। কিন্তু ইউক্লিডের প্রমাণের মতো এই নৈতিক যুক্তিটিও কারো জ্ঞানজ ক্ষমতা, আবেগ, কারো শিক্ষা, কারো গাণিতিক বিশ্বাস, সমাজের মানুষের বিশ্বাস, ইংরেজি ভাষা অথবা ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কারো জ্ঞান থাকা না-থাকা কোনো কিছুকেই সম্পৃক্ত করে না। এবং এই যুক্তিটি প্রমাণের জন্য উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে কোন তথ্যেরও প্রয়োজন নেই। যুক্তিটি নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট। অন্যান্য বিষয়ের তথ্য জানা না থাকলেও 'এক্ষেত্রে যে অনুভূতিনাশক ব্যবহার করা উচিত' এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয় না। উক্ত যুক্তিটির অযথার্থতা প্রমাণ করতে হলে যুক্তিটির নিজের মধ্যেই কোন ভুল আছে, সেটা দেখাতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নীতিবিদ্যা হচ্ছে স্বায়ত্তশাসিত বা স্বয়ংসম্পূর্ণ। আসলে 'একজনের কী করা উচিত?' এই সংক্রান্ত যুক্তিতে অন্যান্য বিষয়ের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ কম। উক্ত যুক্তির ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভূতিনাশক মুখ্য বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত যুক্তি সঠিক।

যখন কেউ উক্ত যুক্তি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিন্তা করে তখন ঠিক কী ঘটছে প্রকৃতিবাদী তত্ত্ব সেটা বর্ণনা করে এভাবে– একজন সেই তথ্যকে বিবেচনা করছে যে তথ্যের এমন শক্তি আছে যা তার মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ হিউমের ভাষায় সে বিবেচনা করছে তার 'স্বভাবের শাসনতন্ত্রকে'। তার স্বভাব যা কিনা গঠিত হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা তা তার মধ্যে শিশুর প্রতি নিরাপত্তাদানকারী অনুভূতি এবং অন্যান্য মানুষের প্রতি যত্নশীল হওয়ার স্বভাব জাগ্রত করে, অন্তত পক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত। সুতরাং উক্ত যুক্তির ক্ষেত্রে তথ্য বা ঘটনার মধ্য দিয়ে চিন্তা করার ফসল হচ্ছে, অনুভূতিনাশক প্রয়োগ করার প্রতি অনুমোদনের অনুভূতি জাগ্রত হওয়া। 'ইহা করা উচিত' বলে যা সিদ্ধান্তবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যদি উক্ত তথ্য বা ঘটনার মধ্য দিয়ে চিন্তা না করে তার বাইরে থেকে চিন্তা করা হয় তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়ায়? বাইরে থেকে আমরা দেখি তার মানব প্রকৃতি, তার অনুভূতি, তার জ্ঞানজ ক্ষমতার কার্য এবং শিশু ও অনুভূতিনাশক এই সবকিছুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ভেতর দিক থেকে যখন সে চিন্তা করে, তখন সে উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে না। তখন সে সরলভাবে যুক্তিটির মাধ্যমে চিন্তা করে। একমাত্র এই অর্থেই প্রকৃতিবাদ আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যাকে পরিত্যাগ করেছে বলে মনে হয়। প্রকৃতিবাদ বাইরে থেকে একটি দৃষ্টিভঙ্গি

সরবরাহ করেছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তা সকল ধরনের আকর্ষণীয় তথ্য প্রদান করেছে। কিন্তু এটি কিছু জিনিস বাদ দিয়েছে যা কেবলমাত্র ভেতর থেকে বুঝা যেতে পারে, যেমন– যুক্তির আদর্শনিষ্ঠ শক্তি। বাইরে থেকে পরীক্ষা করলে আদর্শনিষ্ঠ বিষয়গুলো থাকে না, কারণ যখন আমরা যুক্তিটি সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করি তখন একে উদ্ধৃত করি, এর উপর মন্তব্য করি এবং যা কিছু কার্যকে পরিচালিত করে তার সম্বন্ধে কিছু বলি না।

৫. উপসংহার

দর্শনের কোনো মতবাদই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তেমনিভাবে নীতিবিদ্যার প্রকৃতিবাদী তত্ত্বকে সম্পূর্ণ পরিপক্ব মনে নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের কি বলা উচিত যে এটা ভ্রান্ত মতবাদ এবং একে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা দরকার? অথবা আমাদের কি বলা উচিত যে এটা অসম্পূর্ণ? যদি আমরা প্রকৃতিবাদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করি, তাহলে আমরা নীতিবিদ্যার স্বরূপ বিষয়ক এক বিরাট সংখ্যক বিচারবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিকে চির বিদায় জানাবো। নীতিদর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এর অধিকাংশ মতবাদই প্রকৃতিবাদী নীতিবিদ্যার আওতাভুক্ত। প্রকৃতিবাদকে নৈতিক মতবাদ হিসেবে ধরে নেওয়ার সুবিধা হল–এটি তথ্য ও মূল্যের মধ্যে এক ধরনের সেতুবন্ধনের প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ নৈতিক উক্তি তার মূল্যগত মাত্রার ঊর্ধ্বে উঠে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেরা নৈতিক যুক্তিকে ভেতর দিক থেকে চিন্তা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নৈতিক চিন্তা এবং আবেগ, গুণসমূহের স্বরূপ যার সাথে নৈতিক পদসমূহ সম্পর্কিত এবং আরও অন্যান্য বিষয় যার সাথে নীতি দার্শনিকেরা জড়িত হয়ে আছেন ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে কিছুই বলতে পারি না। বাস্তবিক পক্ষে আমরা নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে আদৌ কিছু বলতে পারি না। এমনকি আমরা প্রকৃতিবাদেরও সমালোচনা করতে পারি না কেননা এটা স্বায়ত্তশাসিত। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে, নৈতিক চিন্তা যখন ভেতর দিক থেকে কাজ করে, নীতিদর্শন তখন কাজ করে বাইরের দিক থেকে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. উনবিংশ শতাব্দীর একটি জনপ্রিয় মতবাদ। মতবাদটির প্রবক্তা হচ্ছেন দুইজন জার্মান দার্শনিক J. F. Fries এবং F. E. Beneke. এই মতবাদটি তার নব্য কান্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বলে যে, মনোবিজ্ঞান হচ্ছে দর্শনের ভিত্তি এবং অন্তর্দর্শন হচ্ছে দার্শনিক অনুসন্ধানের মৌলিক পদ্ধতি। দর্শনের সকল শাখা-প্রশাখা প্রায়োগিক মনোবিজ্ঞানের বেশি কিছু নয়। [আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: Nicholas Bunnin and Jiyuan Yu, *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy* (UK: Blackwell Publishing, 2004), p. 575]

২. G. E. Moore, *Principia Ethica*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1903), P. 92

৩. John Hospers, *An Introduction to Philosophical Analysis*, 2nd edition, (New Jersey, U.S.A.: Englewood Cliffs, 1953), pp. 568-569

৪. Wilfrid Sellars and John Hospers, *Readings in Ethical Theory*, (ed.), 2nd edition (New Jersey, U.S.A.:Printice Hall Inc., Englewood Cliffs, , 1970), pp. 212-213

৫. Glen Newey, *Routledge Philosophy Guide Book to Hobbes and Leviathan* (England: Routledge, 2008) p. 18

৬. David Hume, *A Treatise of Human Nature*, L. A. Selby-Bigge (ed.) (Oxford: Clarendon Press, 1888), p. 468

৭. Max Black হচ্ছেন একজন ব্রিটিশ আমেরিকান দার্শনিক যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একজন প্রভাবশালী বিশ্লেষণী দার্শনিক ছিলেন। ভাষা দর্শন, গাণিতিক দর্শন ও বিজ্ঞান এবং শিল্প দর্শনে তাঁর অবদান ছিল। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে *The Nature of Mathmatics*.

৮. David Hume, *op.cit.*, p. 457

৯. Max Black, `The Gap Between `Is' and `Should'', The Philosophical Review, 73, (U.S.A.: Duke University Press 1964), pp. 165-170
১০. James Rachels, "Naturalism", *The Blackwell Guide to Ethical Theory* (Oxford: Blackwell Publishing, 2000), pp. 82-84
১১. *Ibid.* p. 84
১২. David Hume, *op.cit.*, p. 415
১৩. W. D. Ross(trans.), *The Basic Works of Aristotle* (New York: Random House, 1931), p. 1147b
১৪. David Hume, *op.cit.*, p. 469
১৫. Charles Darwin, *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex* (London: John Murray, 1871), p. 80
১৬. W. D. Hamilton ব্রিটিশ প্রকৃতিবাদী এবং প্রজননবিদ্যা বিশ্লেষক। তিনি ডারউইনের দুটি অনম্পিন্ন সমস্যার সমাধান করেছিলেন: (১) পরার্থবাদের ক্রমবিকাশ ও (২) যৌন প্রজননের ক্রমবিকাশ। Hamilton এর মতে, জ্ঞাতিত্ব নির্বাচন হচ্ছে এক ধরনের অভিব্যক্তিমূলক কৌশল যা জীবের জ্ঞাতির বংশবিস্তারে সাহায্য করে। এমনকি এটা জীবের নিজের টিকে থাকার এবং বংশবিস্তারেরও একটা কৌশল। জ্ঞাতিত্ব নির্বাচন হচ্ছে সর্বব্যাপী উপযুক্ততার নিদর্শন স্বরূপ। (Wikipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kin_selection Date: 01/02/2017.) আরও দেখুন: "kin selection." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Student and Home Edition. (Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011).
১৭. Charles Darwin, *op.cit.*, p. 163
১৮. R. C. Lewontin, `Survival of the Nicest?', *The Newyork Review of Books* (U.S.A.: Harvard University Press, 1998), p. 394
১৯. David Gauthier, *Morals By Agreement* (Oxford: Oxford University Press, 1986), p. 65
২০. শেখ আব্দুল ওহাব, *বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ৬০-৬১
২১. Thomas Nagel, *The Last Word* (New York: Oxford University Press, 1997), pp. 135-140